The Financial Express

05 JUL 2025

...eaking new ground in market diversification

US stays BD's top export destination, new markets expanding

JASIM UDDIN

Bangladesh is breaking new ground in market diversification with robust trade growth elsewhere while the United States stays as its single-largest export destination with a 14.38-percent annualised growth in the just-past fiscal year.

Netherlands, Sweden, Mexico among those showing robust growth

Non-traditional markets like the Netherlands, Sweden and Mexico, meanwhile, showed robust growth, according to data from the Export Promotion Bureau (EPB) -- indication that much-envisaged market diversification shows promise.

According to the latest data on top 20 export destinations, exports to the United States totalled $8.69 billion during the past July-June period, up from $7.60 billion a year earlier.

The US accounted for over 18 per cent of Bangladesh's total export earnings of $48.28 billion in FY25.

Germany and the United Kingdom followed as the second-and third-largest export destinations, receiving $5.29 billion and $4.62 billion worth of goods respectively.

Exports to Germany grew by 9.11 per cent while to the UK by 3.23 per cent.

Among the fastest-growing markets, the Netherlands stood out with a 21.72-percent year-on-year growth, reaching $2.35 billion.

Sweden and Mexico also recorded impressive growth rates of 15.66 per cent and 15.45 per cent respectively, indicating growing diversification in Bangladesh's export destinations.

India, another emerging destination, imported $1.76 billion worth of goods, up by 12.43 per cent year on year.

Meanwhile, exports to Canada and Belgium increased by 11.26 per cent and 10.72 per cent respectively.

However, in top 20 destinations, exports to some emerging markets declined in the last fiscal year. Earnings from China dropped by 2.92 per cent to $694.49 million, while exports to Russia plummeted by 10.24 per cent to $353.96 million. Exports to South Korea also slipped, by 5.89 per cent, although export to Korea registered a big growth in FY24.

The EPB data suggest that while Bangladesh continues to rely heavily on traditional markets in North America and Europe, its outreach to newer or previously smaller markets is gaining traction.

As per the data, renaming countries, calculated under 'others' category comprising non-major markets, grew by 8.30 per cent and accounted for over $7.18 billion in exports.

In general, all destinations excepting the European Union, the United States, Canada, and the United Kingdom are considered non-traditional markets.

Exporters and policymakers view this diversification as critical for reducing dependency on a few key markets and ensuring resilience amid global economic shifts.

In such trade transition, small markets become second-largest collective bloc.

In addition to strong gains in traditional destinations, Bangladesh's exports to 'other markets' -- those outside the top 20 trading partners -- grew by 8.30 per cent year on year, totalling $7.18 billion in FY 2024-25, up from $6.64 billion in FY24.

This group accounted for nearly 15 per cent of total exports, underscoring the country's strategic pivot toward new regions across Africa, Latin America, Southeast Asia, and the Middle East.

The other markets contributed roughly 14.88 per cent to Bangladesh's total exports in FY25 -- making it the second-largest collective bloc, after the US.

Trade experts say this growth validates government incentives under the Export Policy 2021-2024, which aims to reduce overdependence on North America and Western Europe by encouraging market exploration in underrepresented regions.

Talking with The Financial Express, Dr M. Masrur Reaz, Chairman and CEO of Policy Exchange Bangladesh, said exports to Russia declined due to the ongoing war.

He further explains that "trade and financial mechanisms with Russia have been disrupted due to sanctions on a large portion of Russian banks and financial institutions".

Dr Reaz also mentions that China is currently experiencing deflationary pressure, with local manufacturers offering their products at very low prices to domestic consumers. "As a result, exports to China may be affected."

He notes that local Chinese producers are now more competitive than those from other countries.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) President Mahmud Hasan Khan Babu details their efforts for both market and product diversification for the biggest export earner of the country to navigate possible headwinds.

About non-traditional markets he says, "There are some issues in the non-traditional markets, which is why we sometimes see a good growth, in some cases see a decline."

He has emphasized the need to work seriously on boosting exports to non-traditional markets as part of their broader goal to diversify export destinations.

"We are also working on product diversification," he added.

Babu also mentions that there is a good number of work orders in hand, which indicates that apparel exports have the potential to grow further.

However, he notes that cashing in on this opportunity depends on the smooth supply of gas and electricity, alongside cooperation from government agencies and supportive policies.

newsmanjasi@gmail.com

CamScanner

বণিক বার্তা

05 JUL 2025

ইউএসটিআরের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বাণিজ্য উপদেষ্টা

শুল্কারোপের পরও বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অটুট রাখতে সংবেদনশীল যুক্তরাষ্ট্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কারোপের পরও বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অটুট থাকবে। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রও সংবেদনশীল। ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভের (ইউএসটিআর) সঙ্গে প্রথম সভায় এমনটাই আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

বৈঠক সূত্র জানিয়েছে, প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র পক্ষ যথেষ্ট রকমের সংবেদনশীল। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতি স্থিতিশীলতা নিয়ে সংশয় মুক্ত হতে পারছেন না কেউ।

বৈঠকের বিষয়ে গতকাল রাতে বাণিজ্য উপদেষ্টা বণিক বার্তাকে বলেন, 'মিটিং বেশ ভালো ছিল। আমরা আমাদের প্রস্তাবনা তুলে ধরেছি। কাঠামোগত দুইটা বিষয়। এগ্রিমেন্টের ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে আলোচনা। ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে ট্যারিফ, নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের যে আকাঙ্ক্ষা, এগুলোর সঙ্গে সংগতি রেখে বাণিজ্য বৃদ্ধি করার জন্য কী করতে পারি সেটা নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনাটায় ছিল ট্যারিফ লাইন অর্থাৎ ডিউটি কী হবে। দুটি বিষয় নিয়েই ভালো আলোচনা হয়েছে।'

প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বেটার কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, 'আমি যুক্তরাষ্ট্র পক্ষকে যেটা বলার চেষ্টা করেছি তারা যেন আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ইনকম্পিটেন্স তৈরি না করে। আমরা তাদের একটা কম্পিটিটিভ সোর্স। অতিরিক্ত ডিউটি আরোপ করে যদি আমাদের অপ্রতিযোগী করে দেয়, সেটা তাদের জন্য ভালো না, আমাদের জন্যও ভালো হবে না। দিনশেষে ভোক্তারাই উচ্চ মূল্য পরিশোধ করবে। আমরা আমাদের কাঠামোগত পরিবর্তন প্রস্তাব করেছি। তাদের ট্যারিফ কী হবে, সেটা তারা বিস্তারিত দেবে।'

উপদেষ্টা আরো বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র থেকে যেসব পণ্য আমদানি হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুল্ক শূন্যের কাছাকাছি। হয় শূন্য, নয়তো শূন্যের কাছাকাছি। এর পরও তারা বেশকিছু প্রডাক্ট লাইনে আমাদের ওপর অতিরিক্ত কিছু শুল্ক ও সুবিধা চায়। তার পরও তারা শুল্ক আরোপ করবে। সেক্ষেত্রে আমরা যেন প্রতিযোগী থাকতে পারি, সে বিষয়ে তারা সংবেদনশীল। আশা করা যায়, একটা পজিটিভ কিছু হতে পারে।'

ইউএসটিআরের সঙ্গে সভায় যোগ দিতে বুধবার সন্ধ্যায় ওয়াশিংটনের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়েন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। গত ২ এপ্রিল বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ওপর উচ্চহারে পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পরে তা তিন মাসের জন্য কার্যকর স্থগিত রাখার ঘোষণা দেন তিনি, যার মেয়াদ ৯ জুলাই শেষ হবে। বাংলাদেশের ওপর আরোপিত পারস্পরিক শুল্ক চুক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করতে আগে থেকেই ওয়াশিংটনে রয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান।

প্রথম আলো

05 JUL 2025

যুক্তরাষ্ট্রে ‘ভালো’ শুল্কছাড়ের আশায় বাংলাদেশ

পাল্টা শুল্ক নিয়ে আলোচনা

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রে। আবার বৈঠক হতে পারে ৯ জুলাই।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

- ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন দেশ।
- যুক্তরাজ্য, চীন ও ভিয়েতনামের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোগত চুক্তির ঘোষণা এসেছে।
- যুক্তরাষ্ট্র-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনায় অচলাবস্থা।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে পাল্টা শুল্ক ঠেকাতে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন দেশ। কোনো কোনো দেশের সঙ্গে চুক্তির কাছাকাছি চলে গেছে যুক্তরাষ্ট্র। কোনো কোনো দেশের সঙ্গে চুক্তির আলোচনায় নতুন জটিলতাও তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান ও বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন পাল্টা শুল্কের বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন। সূত্র জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের আলোচনা হয়েছে। পরবর্তী বৈঠক হতে পারে ৯ জুলাই। বাংলাদেশের বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান বৈঠকটিতে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারেন।

বাণিজ্য উপদেষ্টা গত রাতে প্রথম আলোকে বলেন, ‘ইউএসটিআরের (যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি) সঙ্গে গতকাল (৩ জুলাই) একটা বৈঠক করেছি। আমরা এখনো আশা করছি, ভালো একটা শুল্কছাড় পাব। আমাদের দিক থেকে কাঠামোগত ও শুল্কগতভাবে যত কিছু ছাড় দেওয়া সম্ভব, অর্থনীতির সক্ষমতা বিবেচনায় তার সর্বোচ্চ চেষ্টা আমরা করেছি।’

শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, ‘৯ জুলাই আরেকটি বৈঠক আছে। ভালো ফল পাব আশা করছি। ৩ জুলাইয়ের বৈঠকে ইউএসটিআর আমাদের আশ্বাস দিয়েছে, ছাড় পাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা প্রতিযোগীদের চেয়ে পিছিয়ে থাকব না।’

বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানি করে গড়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক দিয়ে। গত ৩ এপ্রিল হঠাৎ ট্রাম্প প্রশাসন পাল্টা অর্থাৎ বাড়তি ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয়। এতে মোট শুল্ক দাঁড়ায় ৫২ শতাংশ। শুল্ক আরোপের কার্যকরের তারিখ ছিল গত ৯ এপ্রিল। তবে ওই দিনই যুক্তরাষ্ট্র অন্য দেশের মতো বাংলাদেশের ওপর আরোপিত নতুন শুল্কহারের ঘোষণাও তিন মাসের জন্য স্থগিত রাখে। স্থগিতের মেয়াদ শেষ হবে ৯ জুলাই।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্রের বাজার গুরুত্বপূর্ণ। ফলে তারা জোর আলোচনা চালাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের ছাড়ও দিচ্ছে, যাতে চুক্তি হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য গত মাসেই বাণিজ্য চুক্তির ঘোষণা দেয়। ৮ মে হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে একে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিবিসির খবর অনুযায়ী, গত ২৭ জুন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বাণিজ্য চুক্তিতে সই করেছে বলে জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চলমান বাণিজ্যযুদ্ধ অবসানের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই চুক্তি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও চীন ‘জেনেভা চুক্তি’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সমঝোতায় পৌঁছেছে। মে মাসে সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় বাণিজ্যযুদ্ধের বিরতি নিয়ে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা হয়, তিনি মূলত সেই প্রসঙ্গে এ মন্তব্য করেন। সেখানে দুই দেশ সাময়িক বাণিজ্যযুদ্ধ-বিরতিতে সম্মত হয়।

ওই কর্মকর্তা আরও জানান, মূলত চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বিরল খনিজ রপ্তানি দ্রুত পুনরায় চালু করার প্রক্রিয়া নিয়ে এই সমঝোতা। চুক্তিটি জেনেভা চুক্তির ধারাবাহিকতা। জেনেভায় উভয় পক্ষই একমত হয়েছিল, পরস্পরের পণ্যে আরোপিত শুল্ক ও পাল্টা শুল্ক ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করা হবে। লক্ষ্য ছিল, দ্রুতই বৃহৎ বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছানো। পরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত এক আলোচনায় চূড়ান্ত চুক্তির কাঠামো নির্ধারিত হয় এবং ট্রাম্প যে চুক্তির কথা বলেছেন, সেটি সম্ভবত সেই কাঠামোর আনুষ্ঠানিক রূপ। পূর্ণাঙ্গ চুক্তির সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে আগস্ট মাস।

এদিকে গত বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, ভিয়েতনামের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে। এখন থেকে ভিয়েতনাম থেকে আমদানি পণ্যে যুক্তরাষ্ট্র ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবে। এর আগে গত এপ্রিল মাসে ট্রাম্প ঘোষিত পাল্টা শুল্কনীতির আওতায় এসব পণ্যে ৪৬ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক বলেন, যদি অন্য কোনো দেশ তাদের পণ্য ভিয়েতনামের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠায়, তাহলে সেসব পণ্যে ৪০ শতাংশ শুল্ক আরোপ হবে। তবে নতুন চুক্তি অনুযায়ী, ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে শুল্ক আরোপ করবে না। তবে চুক্তিটি চূড়ান্ত হয়েছে কি না বা ভিয়েতনাম এই শর্তে রাজি হয়েছে কি না, তা এখনো পরিষ্কার নয়।

ভিয়েতনামের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম ভিয়েতনাম নিউজ জানিয়েছে, দেশটির কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক তো লাম বুধবার ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। যদিও তিনি এই বিষয়কে ‘কাঠামোগত চুক্তি’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ইউরোপীয় কমিশনার মারোস সেফচোভিচ ১ জুলাই আলোচনার জন্য ওয়াশিংটনে গেছেন। মার্কিন খসড়া প্রস্তাব ইতিবাচকভাবে নিয়েছে ইইউ। তবে তারা স্পষ্ট করেছে, সামাজিক মাধ্যম ও প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানের ওপর ইউরোপের কঠোর নিয়ন্ত্রণের নীতি এই আলোচনার আওতায় আসবে না।

রয়টার্সের সংবাদে বলা হয়েছে, ইউরোপ ১০ শতাংশ হারে অভিন্ন শুল্ক চায়। সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ওষুধ, মদ, সেমিকন্ডাক্টর ও বিমান খাতে শুল্ক কমানোর প্রতিশ্রুতি দিক, সেটাও তারা চায়। তারা গাড়ি, ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামে শুল্ক ছাড় চায়।

ইকোনমিক টাইমস-এর এক খবর অনুযায়ী, শুরুতে আশাবাদ থাকলেও অতি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনায় অচলাবস্থ তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে অভিযোগ, ভারত এখনো কৃষিপণ্য, ইস্পাত ও গাড়ির যন্ত্রাংশে শুল্ক ছাড় দিচ্ছে না। ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা ওয়াশিংটনের সঙ্গে আরও আলোচনায় রাজি। মূল বিরোধ দুধ, বাদাম, সয়াবিনসহ কৃষিপণ্যে ভারত কতটা ছাড় দিতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় ইস্পাত ও গাড়ির যন্ত্রাংশে শুল্ক কমাবে কি না, তা নিয়ে। ভারতের আশা ছিল, ৯ জুলাইয়ের মধ্যে প্রাথমিক চুক্তি হয়ে যাবে; কিন্তু এখন তা নিয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

রয়টার্সের সংবাদে বলা হয়েছে, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও থাইল্যান্ডের মতো দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনা চলছে।

বাংলাদেশ কী করছে

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের শুল্ক চুক্তির সম্ভাবনা আছে বলে এর আগে জানিয়েছিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। চুক্তির খসড়াও তৈরি হয়েছে, যা নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা শুরু হয়েছে। সরকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে উড়োজাহাজ, তুলা ও গম কেনার পরিকল্পনা নিয়েছে।

ইউএসটিআরের সঙ্গে বৃহস্পতিবারের আলোচনার বিষয়ে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস সূত্রে জানা যায়, আলোচনা ইতিবাচকভাবেই এগোচ্ছে। চুক্তি এখনই করা সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ওপর শুল্ক আরোপ স্থগিত থাকার মেয়াদ বাড়তে পারে।

সমকাল

05 JUL 2025

যেভাবে সৌদির বাংলাবাজার জয় করল হাফিজুরের মুড়ি

■ সমকাল প্রতিবেদক

সতেরো বছর আগে সৌদি আরবে পাড়ি জমান নোয়াখালীর হাফিজুর রহমান। আর দশজন অভিবাসীর মতোই সীমিত আয় দিয়ে প্রবাসজীবন শুরু করেন তিনি। ভাগ্য বদলের যাত্রা নতুন দিকে মোড় নেয় দ্রুতই। বছর দুয়েকের মাথে ভাতিজা মাহমুদের সহায়তায় হাফিজুর গড়ে তোলেন ছোট্ট একটি মুদি দোকান। দীর্ঘ ১৫ বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর সেই দোকান আজ রূপ নিয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ সুপারশপে। উপমহাদেশীয় পণ্যের বড় সংগ্রহ থাকায় রিয়াদের বাংলাবাজারে অবস্থিত সুপারশপটি এরই মধ্যে বাংলাদেশি, ভারতীয় ও পাকিস্তানি অভিবাসীদের একটি পছন্দের গন্তব্যে পরিণত হয়েছে।

ব্যবসা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাফিজুর লক্ষ্য করেন সৌদিতে বাংলাদেশি অনেক পণ্যের চাহিদা থাকলেও সরবরাহ একেবারেই অপ্রতুল। তাই পর্যাপ্ত উপমহাদেশীয় ক্রেতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর দোকানের তাক ভর্তি থাকত সৌদি, ভারতীয় ও পাকিস্তানি পণ্যে।

বড় বাংলাদেশি ব্র্যান্ডগুলোর সৌদির বাজারে প্রবেশের আগে এটিই ছিল রিয়াদের এফএমসিজি বা ভোগ্যপণ্যের বাজারের চিত্র। সময়ের সঙ্গে শুধু বাংলাদেশের বড় কোম্পানিগুলোই এই বাজারে জায়গা করে নিতে পেরেছে। মাঝারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্য চাহিদা সত্ত্বেও অনেকটাই অনুপস্থিত। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে হাফিজুর দেখতে পান রপ্তানিতে সঠিক দিকনির্দেশনার অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও জটিল রপ্তানি অবকাঠামোই এর পেছনে দায়ী।

এসব সমস্যা হাফিজুর আরও প্রকটভাবে অনুভব করেন যখন তিনি নিজেই বাংলাদেশ থেকে সৌদিতে মুড়ি রপ্তানি করতে যান। রপ্তানি প্রক্রিয়ায় পদে পদে হোঁচট খেতে হয় তাঁকে। এলসি খোলা, বন্দরের কার্যক্রম, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স সবকিছুই তাঁর কাছে এক দুর্বোধ্য জটিল প্রক্রিয়া বলে মনে হয়। হতাশ হয়ে পড়েন হাফিজুর। গল্পের মোড় ঘুরে যায় যখন হাফিজুর পরিচিত হন বিটুবি (বিজনেস টু বিজনেস) সাপ্লাই চেইন প্ল্যাটফর্ম শপআপের সঙ্গে। মূলত বাংলাদেশের ভেতরে খাদ্যপণ্য, মুদি সামগ্রী ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করে থাকলেও

> শপআপের নতুন চ্যানেল ব্যবহার করে সাড়ে ১৯ টন মুড়ি সৌদি নিয়েছেন তিনি

নিজেদের সরবরাহ সক্ষমতা সম্প্রতি দেশের সীমানার বাইরেও বিস্তৃত করেছে দেশীয় প্রতিষ্ঠানটি। সৌদি আরবভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউশন ফার্ম 'সারি' শপআপের সঙ্গে একীভূত হয়ে গঠন করেছে সিল্ক, যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন আন্তর্জাতিক ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল। শপআপের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ চ্যানেল ব্যবহার করে অনেক বাংলাদেশি পণ্যই এখন পৌঁছে যাচ্ছে সরাসরি সৌদির বিভিন্ন দোকানে।

এ সুযোগ লুফে নেন হাফিজুর। শপআপের নতুন চ্যানেল ব্যবহার করে এলসিসহ অন্যান্য কাইবস ও রপ্তানিসংক্রান্ত জটিলতা ছাড়াই বিগত রমজানে ছয় কনটেইনার বোঝাই সাড়ে ১৯ টন মুড়ি সৌদি আরবে পৌঁছাতে সক্ষম হন তিনি। নোয়াখালী থেকে সংগৃহীত মুড়ি ব্র্যান্ডিং ও প্যাকেজিং করেন বড় ছেলে 'আনাস'-এর নামে। সৌভাগ্যক্রমে খুব অল্প সময়েই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তাঁর মুড়ি। নিজের শপ ছাড়াও রিয়াদের অন্যান্য সুপারশপ ও মুদি দোকানেও শুরু করেন সরবরাহ।

হাফিজুর বলেন, 'সৌদির বাজারে সব সময়ই বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা ছিল, কারণ এখানে প্রচুর বাংলাদেশি প্রবাসী রয়েছেন। আমাদের মুড়ি এখানে জনপ্রিয় হয়েছে। আমি ভবিষ্যতে আরও পণ্য আনব যেন আমাদের প্রবাসী ভাই-বোনেরা এখানে বসে দেশের স্বাদ পেতে পারেন। তিনি বলেন, 'যখন প্রথম রপ্তানির প্রক্রিয়া শুরু করি, কিছুই বুঝতাম না। অনেক হতাশ ছিলাম। শপআপ পুরো প্রক্রিয়া খুব সহজ করে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, আমার মতো অনেক ছোট ব্যবসায়ীর উপকার হবে এই সেবায়।'

মুড়ি বিক্রি করে জনপ্রিয়তা পেলেও এখন কেবল মুড়িতে সীমাবদ্ধ থাকতে চান না হাফিজুর। বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক ও মৌসুমি নানান পণ্য যেমন– পানপাতা, খেজুরের গুড়, দেশি ফল ইত্যাদিও সৌদির বাজারে আনতে চান তিনি। প্রবাসীদের মাঝে এসব পণ্যের চাহিদা থাকলেও পচনশীল হওয়ার কারণে এতদিন সেভাবে সৌদির বাজারে পৌঁছতে পারেনি। সারির আন্তর্জাতিক সাপ্লাই চেইন নেটওয়ার্ক এখন সেই স্বপ্ন দেখাচ্ছে হাফিজুরকে।

হাফিজুরের এ সফলতা শুধু বাংলাদেশি পণ্য মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করেনি, পাশাপাশি বিশ্ববাজারে আমাদের দেশীয় পণ্যের ব্র্যান্ডিংয়ে উন্মোচন করেছে এক নতুন দিগন্ত। দেশের মাটিতে ফলানো কৃষকের কষ্টের ফসল যখন বিদেশের মাটিতে প্রবাসীর মুখে হাসি ফোটায়, তখন তা ব্যবসা ছাপিয়ে হয়ে ওঠে বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশি পণ্যের গর্বিত পথচলার গল্প।

সমকাল
05 JUL 2025

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কতটা প্রস্তুত দেশের ওষুধশিল্প

এলডিসি থেকে উত্তরণ

■ আনোয়ার ইব্রাহীম

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ওষুধ খাত ছিল প্রায় পুরোটাই বহুজাতিক কোম্পানি ও আমদানিনির্ভর। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকা দামি ওষুধ আমদানি করা হতো মূলত ভারত, পাকিস্তান ও ইউরোপ থেকে। সেই সময় দেশীয় উদ্যোগে ওষুধ উৎপাদন ছিল সীমিত, গুণগত মানও ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। আশির দশকের শুরুর দিকে ওষুধ খাতে আমূল পরিবর্তন আনে ১৯৮২ সালের জাতীয় ওষুধনীতি। এতে বহুজাতিক কোম্পানির একচেটিয়া দাপট কমে আসে, গুণগত মান ও ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতের মাধ্যমে দেশীয় কোম্পানিগুলো ধীরে ধীরে আস্থা অর্জন করতে থাকে। গত চার দশকে দেশে ওষুধের অভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রায় সম্পূর্ণটাই স্থানীয়ভাবে পূরণ হচ্ছে। একই সঙ্গে এ খাত রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবেও বিকশিত হয়েছে।

২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এই উত্তরণ বড় অর্জন হলেও এতে বাংলাদেশের ওষুধশিল্পের জন্য নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে। এলডিসি মর্যাদার কারণে বাংলাদেশ এতদিন ট্রিপস চুক্তির আওতায় ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্যে পেটেন্ট সংরক্ষণ থেকে অব্যাহতি পেত। ফলে বাংলাদেশি কোম্পানিগুলো পেটেন্ট না থাকা সত্ত্বেও উদ্ভাবনী ওষুধের জেনেরিক সংস্করণ তৈরি ও বিক্রি করতে পারত। যে কারণে দেশের জনস্বাস্থ্য, ওষুধের দাম এবং রপ্তানি সক্ষমতায় সহায়ক হয়েছে।

এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর পরবর্তী সর্বোচ্চ তিন বছর এ সুবিধা ভোগ করতে পারবে বাংলাদেশ। অর্থাৎ ২০২৯ সাল থেকে পেটেন্ট সুরক্ষা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। তখন আর কোনো বিদেশি কোম্পানির অনুমতি ছাড়া উদ্ভাবনী ওষুধ তৈরি সম্ভব হবে না। পেটেন্টধারীদের রয়্যালটি দিতে হবে, যার পরিমাণ হতে পারে প্রতি পণ্যে ৩০ থেকে ৫০ লাখ ডলার পর্যন্ত। এতে উৎপাদন ব্যয় ও রপ্তানি প্রতিযোগিতা–দুই ক্ষেত্রেই বড় ধাক্কা আসবে বলে আশঙ্কা করছেন খাতসংশ্লিষ্টরা। ফলে উৎপাদন ব্যয় বাড়বে, জেনেরিক ওষুধের বাজার সংকুচিত হবে এবং রপ্তানিতেও প্রভাব পড়ার শঙ্কা আছে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিচালক ড. মো. আকতার হোসেন জানান, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন একটি বাস্তবতা। এ কারণে ওষুধ খাত যে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে, সে বিষয়ে সরকার সচেতন আছে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে ওষুধ উদ্ভাবনে গবেষণা কম হয়। ফলে যতদিন না নিজেরা ওষুধ উদ্ভাবনে সক্ষম হব, ততদিন অন্য দেশের পেটেন্ট করা দেশে প্রস্তুতের জন্য আমাদের রয়্যালটি দিতে হবে। এতে ওষুধের উৎপাদন ব্যয় কিছুটা বাড়বে–এটি সত্যি।

আকতার হোসেন আরও বলেন, এই খরচ কমাতে পারি যদি ওষুধ প্রস্তুতের কাঁচামালে আমদানি নির্ভরতা কমাতে এবং তা দেশেই প্রস্তুত করতে পারি। তবে ওষুধ খাতে এখনও বড় সীমাবদ্ধতা হলো–অধিকাংশ কাঁচামাল বা সক্রিয় উপাদান এপিআইর আমদানি নির্ভরতা। মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় সরকার এপিআই পার্ক স্থাপন করেছে। এখানে ২৬টি প্লট আছে, তার মধ্যে মাত্র চারটি প্লট বরাদ্দ নেওয়া হয়েছে। সরকার চায় এখানে ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগে এগিয়ে আসুন। এক্ষেত্রে যেসব অনুমোদনের ইস্যু আছে, তা দ্রুততর করতে প্রস্তুত আছে ঔষধ প্রশাসন।

এমন বাস্তবতায় খাতসংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এই রূপান্তরজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ওষুধশিল্প এখনও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় প্রস্তুত নয়। গবেষণা, উদ্ভাবন, কাঁচামাল উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও দূরদর্শী হতে হবে। নিজেদের ওষুধ উদ্ভাবন করতে হবে। এক্ষেত্রে গবেষণা নেই বললেই চলে।

জানতে চাইলে ওষুধশিল্প সমিতির সভাপতি ও ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মুক্তাদির সমকালকে বলেন, 'এত বড় একটা চ্যালেঞ্জ সামনে, অথচ এর জন্য আমরা যথেষ্ট প্রস্তুত নই। গত এক বছরে আসলে কিছুই হয়নি। সামনে মাত্র একটা বছর আছে।'

আব্দুল মুক্তাদির বলেন, 'এখন পর্যন্ত যত ওষুধ উদ্ভাবন হয়েছে, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের আগে সেগুলোর রেজিস্ট্রেশন করে রাখা দরকার। অথচ ঔষধ প্রশাসনের এ-সংক্রান্ত কমিটির গত দেড়-দুই বছর ধরে মিটিংই হয়নি। এপিআই পার্ক হয়েছে, কিন্তু গ্যাস সংযোগ নেই। ফলে পার্ক পার্কের মতো পড়ে আছে। আশার কথা, সরকার একটি সভা ডেকেছে। আশা করছি, সেখানে এসব বিষয়ে আলোচনা হবে এবং যেসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছি, সেগুলো সমাধানে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ওষুধশিল্প : এক বিস্ময়কর রূপান্তরের গল্প

দেশে বর্তমানে ২৮৪টি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি নিবন্ধিত, যার মধ্যে ২২৯টি সক্রিয়ভাবে উৎপাদনে রয়েছে। চাহিদার ৯৮ শতাংশই জোগান দেয় এসব কোম্পানি। এ বাজারের প্রায় ৭১ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে শীর্ষ ১০টি কোম্পানি। এর মধ্যে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, ইনসেপ্টা, বেক্সিমকো, রেনাটা, অপসনিন, এসকেয়ার, হেলথকেয়ার অন্যতম। বড় কোম্পানিগুলো আধুনিক প্রযুক্তি, গবেষণায় বিনিয়োগ এবং বিস্তৃত বিতরণ কাঠামোর মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে। ছোট-মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে আছে নির্দিষ্ট থেরাপিউটিক শ্রেণিতে, যেমন অ্যান্টিবায়োটিক বা ওভার-দ্য-কাউন্টার ওষুধ।

১৯৮২ সালের ওষুধনীতির মাধ্যমে ১৭৭টি অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ওষুধ নিষিদ্ধ করা হয় এবং ১১৭টি মৌলিক ওষুধের একটি জাতীয় তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এই নীতির প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী (প্রয়াত)।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যমতে, ২০১০ সালে ওষুধশিল্পের বাজার ছিল প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকার, যা ২০২৪ সালে পৌঁছেছে সাড়ে ৪২ হাজার কোটিতে, ইউএস ডলারে প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন। গত এক দশকে এই খাতের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১০-১৪ শতাংশ।

রপ্তানিতে দৃশ্যমান অগ্রগতি

বাংলাদেশ থেকে ওষুধ রপ্তানি শুরু হয় ১৯৮৭ সালে, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস-এর মাধ্যমে। তখন প্রধান গন্তব্য ছিল মিয়ানমার ও আফ্রিকার কিছু দেশ। ২০১৫ সালে বেক্সিমকো যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধ রপ্তানির মাধ্যমে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। এরপর স্কয়ার, ইনসেপ্টা এবং রেডিয়েন্টও এ বাজারে প্রবেশ করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানির আয় ছিল ২১ কোটি ৩২ লাখ ডলার, যা মোট পণ্য রপ্তানির ৪ দশমিক ৪১ শতাংশ। এই হার ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল মাত্র ২ দশমিক ৩৫ শতাংশ। বর্তমানে বাংলাদেশ ১৫৬টির বেশি দেশে ওষুধ রপ্তানি করছে। শীর্ষ ১০টি গন্তব্য হলো– মিয়ানমার, যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, কেনিয়া, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম ও নেপাল।

সামনে চ্যালেঞ্জ, প্রস্তুতির ঘাটতি

দেশীয় কোম্পানিগুলো এতদিন পেটেন্ট ছাড়ের সুবিধায় যে জেনেরিক ওষুধ তৈরি করে এসেছে, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর তা আর সম্ভব হবে না। তখন পেটেন্টপ্রাপ্ত ওষুধ উৎপাদনের জন্য রয়্যালটি দিতে হবে বা লাইসেন্স নিতে হবে। এতে উৎপাদন খরচ বাড়বে এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা কমবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এখন থেকেই উদ্ভাবিত ওষুধগুলোর নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে।

ডেল্টা ফার্মার ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাকির হোসেন সমকালকে বলেন, 'গ্র্যাজুয়েশনের আগেই যত ওষুধ নিবন্ধন করা যাবে, ততই লাভ। কারণ, পেটেন্ট আসার পরও রেজিস্টার্ড পণ্যের ১৫ বছর পর্যন্ত উৎপাদন করা যাবে।' সমস্যাটা হলো, দুই বছর ধরে ঔষধ প্রশাসনের অনুমোদন কমিটির কোনো বৈঠক হয়নি। প্রায় ৫০০ ওষুধ নিবন্ধনের অপেক্ষায় আছে।

কাঁচামালেই মূল দুর্বলতা

বাংলাদেশের ওষুধশিল্প এখনও ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ সক্রিয় উপাদান (এপিআই) আমদানি করে, যার বড় অংশ আসে চীন ও ভারত থেকে। এই নির্ভরতা শুধু দামের ওপর চাপই বাড়ায় না, সরবরাহ ঝুঁকিও বাড়ায়। গজারিয়ায় নির্মিত এপিআই পার্কে এখনও মাত্র ৪টি কোম্পানি কারখানা স্থাপন করেছে। গ্যাস, বিদ্যুৎ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জটিলতার কারণে এ প্রকল্প পুরোপুরি সচল হয়নি।

প্রণোদনা ছাড়া রপ্তানি ধাক্কা খেতে পারে

এলডিসি অবস্থায় বাংলাদেশ ওষুধ রপ্তানিতে ভর্তুকি দিতে পারত। গ্র্যাজুয়েশনের পর সেই সুযোগ থাকবে না। এতে রপ্তানি আয় ৬-৭ শতাংশ কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে রপ্তানিকারকদের জন্য কর ছাড়, গবেষণা সহায়তা এবং বিকল্প প্রণোদনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে মনে করেন শিল্পসংশ্লিষ্টরা।

সক্রিয় হতে হবে নীতিনির্ধারকদের

বিশ্লেষকদের মতে, ওষুধশিল্পে বাংলাদেশের এই অভাবনীয় সাফল্যের পেছনে বড় অবদান ছিল সময়োপযোগী নীতিমালার। নতুন বাস্তবতায়ও তেমনি এক সুসংহত নীতিগত সহায়তা প্রয়োজন। এখন দরকার, দ্রুত ওষুধ নিবন্ধন প্রক্রিয়া সচল করা, এপিআই পার্ক সম্পূর্ণভাবে চালু করা, গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়ানো, আন্তর্জাতিক গুণগত মান রক্ষা, বায়োফার্মার মতো ভবিষ্যৎ খাতকে উৎসাহিত করা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দরিদ্রবান্ধব প্রণোদনা নিশ্চিত করা।

ওষুধশিল্প সমিতির সভাপতি আব্দুল মুক্তাদির বলেন, গত তিন থেকে চার দশক ধরে যে শিল্প গড়ে উঠেছে তা এগিয়ে নিতে হবে। চ্যালেঞ্জ সব সময়ই আসবে। তবে তা মোকাবিলা করতে হবে। আমাদের এখন চ্যালেঞ্জ এপিআই, গবেষণা এবং জনবল সৃষ্টি। এই তিন ক্ষেত্রেই আশির দশকের মতো সরকারের সক্রিয় নীতিসহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।